গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৯ সংখ্যা | ২৩ - ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বামপন্থী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মর্মবস্তুকে অবহেলা করা হয়েছে

জন্মশতবর্ষে কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষা

মনে রাখতে হবে, শুধু না খেয়ে হাত-পা ছুঁড়লেই বা বিক্ষোভের জন্য একটা ঘৃণা বা আক্রোশের দ্বারাই বিপ্লবের

জন্ম হয় না। বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দরকার হয় এবং বিপ্লবের জন্য একটা নৈতিক বল দরকার হয়। এই সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং নৈতিক বল বিবর্জিত বিক্ষুব্ধ জনতার যত মারমুখী আন্দোলনই হোকনা কেন, বারবার তা মুখ থুবড়ে পড়বেই। তাই সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মীদের এবং নেতাদের, তাঁরা যে মতেই বিশ্বাস করুন— যদি তাঁরা বিপ্লব চান, লড়াই চান, তা হলে তাঁদের রাজনীতির মধ্যেও নৈতিকতার প্রশ্নটিকে কোনও মতেই গৌণ করে ধরলে চলবে না। পুঁজিবাদ এবং বুর্জোয়ারা জাতির যে নৈতিক মেরুদণ্ডকে ভাঙতে চাইছে, আমাদের সেই নৈতিক মেরুদণ্ডকে খাড়া করতে হবে আমাদের নিজেদের ব্যবহার, আচার, রুচি, শালীনতার দ্বারা। একটা কথা আপনারা ভেবে দেখবেন। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আমরা যদি সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে মিথ্যা কথা বলাকে উৎসাহিত করি, চাটুকারদের নেতা করে তুলি, মোসাহেবকে নেতা বানাই, তা হলে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই যে, নেতৃত্বের মান নেমে যায়। তারা নেতা হয় ঠিকই এবং লোকে তাদের বক্তৃতা শুনে নেতা বলে মনেও করে, কিন্তু তাদের চরিত্রের কোনও ভিত্তি নেই, নিজস্ব রাজনৈতিক কোনও একটা বিশ্বাস বা ভিত্তি নেই। তারা শুধু নিজেদের কেরিয়ার তৈরির জন্য যা দরকার তাই করে। আজ একে তোষামোদ করে, কাল তাকে তোষামোদ করে, অথবা কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রবণতা এবং মিথ্যা বলার ঝোঁককে প্রশ্রয় দেয়। দলের কোনও কর্মী যদি মিথ্যা বলেও অপরকে ঘায়েল করে দিয়ে আসতে পারে, তা হলে দলের নেতা এদের তারিফ করে। এসব জিনিস বামপন্থী আন্দোলনে প্রশ্রয় দিলে আন্দোলন ভিতর থেকে খেয়ে দেবে। মনে রাখতে হবে,

ছয়ের পাতায় দেখুন

ডেঙ্গু প্রতিরোধের দাবিতে পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙল মিছিল

ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে প্রশাসনের চরম গাফিলতির প্রতিবাদে ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা পুরসভায় বিক্ষোভ

খবর ৭ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর নিষ্ঠুর তামাশা

‘চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হবে’— এই কথা বলে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া সহ রাজ্যের নানা জেলা থেকে আইটিআই, কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত প্রায় দশ হাজার বেকার যুবক-যুবতীকে দিয়ে খড়গপুরের ‘উৎকর্ষ বাংলা’র সভাস্থল ভরানো হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের জন্য। বড় আশায় বুক বেঁধে এসেছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের অপর্ণা, বাঁকুড়ার সুহৃদ, পুরুলিয়ার সোমা, ঝাড়গ্রামের বিকাশরা। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য কথার চাষ ছাড়া আর কিছুই জুটল না।

তাই ‘উৎকর্ষ বাংলা’য় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নেওয়া পশ্চিম মেদিনীপুরের অপর্ণা, ঝাড়গ্রামের শ্রেয়া ভট্টাচার্যরা বলেন, ‘আমাদের তো বলা হয়েছিল এই কর্মসূচি থেকেই নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। কিছুই দেওয়া হল না।’ বদলে মুখ্যমন্ত্রী তাদের পুজোয় কেটলি আর ভাঁড় জোগাড় করে

দুয়ের পাতায় দেখুন

জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল, দুর্নীতিগ্রস্তদের শাস্তি এবং দ্রুত শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে

ছাত্র মিছিলে ভাসল রাজপথ

ছাত্র মিছিল ঃ কলেজ স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ। ১৪ সেপ্টেম্বর

১৪ সেপ্টেম্বর, দুপুর একটা। কলকাতার রাজপথ জুড়ে যতদূর চোখ যায় শত শত লাল পতাকা, ফুটে আছে যেন বসন্তের রক্তপলাশের মতো। আর শক্ত হাতে সেই পতাকা ধরে আছেন সংগ্রামী ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের কর্মী-সংগঠক-স্বেচ্ছাসেবকরা। মাথার ওপর ক্রমশ চড়া হচ্ছে ভাদ্রের প্রখর রোদ, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি প্রখর তাঁদের আদর্শের জোর, প্রত্যয়ের দৃঢ়তা। কেউ বেরিয়েছে ভোরে, কেউ বা আগের দিন। প্রবল বৃষ্টি, রাস্তার জলকাদা, সারা রাত ট্রেনের ধকল পেরিয়ে আন্দোলনের ময়দানে একজোট হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ। সুদূর কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, মেদিনীপুর থেকে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া থেকে পুরুলিয়া এমনকী উত্তরের প্রত্যন্ত চা বাগান অঞ্চল থেকেও ছাত্রছাত্রীরা এসেছে মিছিলে যোগ দিতে। হাতে ধরা পোস্টার, ব্যানার, সমাবেশ থেকে উঠে আসা দৃপ্ত স্লোগান তুলে ধরছিল ওদের দাবিগুলো— অনলাইন নয়, ক্লাসরুম

আটের পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর নিষ্ঠুর তামাশা

একের পাতার পর

চা, ঘুগনি, তেলেভাজা বিক্রির পাশাপাশি কচুরিপানার ব্যাগ থালা, কাশফুলের বালিশ তৈরির পরামর্শ দেন।

অপরদিকে গত ১২ সেপ্টেম্বর নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামের মঞ্চথেকে কয়েক হাজার প্রশিক্ষিতের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, 'বাইরে যাওয়ার দরকার নেই, ঘরের দরজায় এসে ডাকবে চাকরি।' এই বিলি হওয়া নিয়োগপত্র নিয়ে তৈরি হয়েছে এক তীব্র বিতর্ক। বাইরে যাওয়ার দরকার নেই বলে হুগলি এইচ আইটিতে ডেকে যে চিঠিটি ধরানো হয়েছে যুবক-যুবতীদের হাতে, অনুষ্ঠান শেষে তারা দেখল তাতে ফানফার্স গ্লোবাল স্কিলার্সের সহযোগিতায় গুজরাটের সুরেন্দ্রনগর সংস্থায় দু'বছরের জন্য 'ভেহিকল টেকনিশিয়ান' হিসাবে প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের কাছে গুজরাটের ওই সংস্থার সেন্টার ম্যানেজার বেদপ্রকাশ সিংহ দাবি করেছেন ওই কাগজ ভুয়ো। সংস্থাটি গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে এই ধরনের প্রশিক্ষণের কাজে যুক্ত থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের কোনও সংস্থা বা এই রাজ্যের সরকারের সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই। খোদ সরকারের তরফ থেকে রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের প্রতি এই চরম প্রতারণাকে, জালিয়াতিকে কোন ভাষায় আখ্যায়িত করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না পশ্চিমবাংলার জনগণ।

এরকমই এক প্রতারণার শিকার হয়েছিল বাংলার যুবক-যুবতীরা ২০১৩ সালে যুবশ্রী প্রকল্প চালু করার সময়। ওই দিন নেতাজি ইন্ডোরের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত বেকারদের মধ্যে থেকে প্রতি বছর এক লক্ষ যুবক-যুবতীকে যুবশ্রী প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। সরকারের নানা দপ্তরের কাজে, শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স সহ বিভিন্ন পদে এই ১ লক্ষ যুবশ্রীকে নিয়োগ করা হবে। এইভাবে প্রতি বছর এক লক্ষ করে যুবশ্রীকে চাকরি দেওয়া হবে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে আনন্দের সঙ্গে ঘরে ফেরা যুবশ্রীরা আজ হতাশ। তারা আন্দোলন গড়ে তুলছে মুখ্যমন্ত্রীর ২০১৩ সালের প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবিতে।

শুধু তো এবারই নয়, এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী এরকম কথা বলেছেন। বলেছেন, সরকারি চাকরির প্রত্যাশা না করে, খাতা-পেনের দোকান খোলো, মাটি কাটো, তেলেভাজা বিক্রি করে খুঁটে খাও। একইরকম ভাবে পকোড়া ভেজে বেকারত্ব ঘোচাবার কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হোক বা প্রধানমন্ত্রী বা অন্য নেতা-মন্ত্রীরা নির্বাচনকে সামনে রেখে বছরে লক্ষ, কোটি যুবককের বেকারত্ব ঘোচাবার প্রতিশ্রুতি দেন আর ভোট পেরোলেই বলেন ওসব জুমলা, কথার কথা, ভোটের জন্য বলতে হয়। এইসব বক্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নানা 'মিম' হয়, হাসির রোল ওঠে। কিন্তু এগুলো সত্যিই কি এত হালকা বিষয়? হাসির খোরাক? বেকার যুবক-যুবতী এবং তাদের পরিবারের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি না করে যারা ভোটে জিতে ক্ষমতায় বসার জন্য অনায়াসে চাকরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন আর তারপর বলেন যে ভোট পাওয়ার জন্য তা বলতে হয়, কিংবা চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়ার নাম করে ডেকে জ্ঞান বিতরণ করে বলেন, যাও চা, ঘুগনি তেলেভাজা বেচে খেটে খাও, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না বুর্জোয়া ব্যবস্থার এই শাসকদের ভাণ্ডারে জনগণকে দেওয়ার আর কিছু নেই।

খড়্গপুরে উৎকর্ষ বাংলার সভায় মুখ্যমন্ত্রী হাজার হাজার বেকার যুবকদের খেটে খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। বলেছেন, একটু খাটলেই নাকি বিপুল রোজগারের কোনও অভাব নেই। মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠে আমরা জনবিচ্ছিন্ন শাসকের কথা শুনতে পাচ্ছি। উনি কি জানেন না, উদয়াস্ত না খাটলে বাংলার শ্রমজীবী মানুষের নুন ভাতটুকুও জোটে না? এত তাড়াতাড়ি সোনারপুরের অতনু মিস্ত্রীকে কি ভুলে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী? উচ্চশিক্ষিত অতনু হোটেলে ঘর মোছার কাজ করত। শুধুমাত্র অতনু নয়, শিক্ষিত বেকাররা বাসে, ট্রেনে হকারি করে গান গেয়ে যেমন করে হোক উদয়াস্ত শরীরের সবটুকু নিংড়ে দিয়ে কিছু উপার্জন করে কোনও রকমে প্রাণধারণ করে আছেন। প্রাণধারণ করা আর বেঁচে থাকা তো এক নয়! বেঁচে থাকা আরও কিছু বেশি দাবি করে। কিছু অধিকার দাবি করে। যেমন বেঁচে থাকার জন্য কাজের অধিকার কংগ্রেস-বিজেপি কোনও সরকার দিয়েছে কি? এই বাংলায় কাজ না পেয়ে খেটে খাওয়ার জন্যই তারা এই রাজ্য ছেড়ে ভিন রাজ্যে এমনকি ভিন দেশে পাড়ি দিচ্ছে। করোনা পরিস্থিতিতে এই খেটে খাওয়া মানুষরাই তো মাইলের পর মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরেছে। আসলে বেকারত্বের ভয়াবহ এই সমস্যায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মতো রাজ্যের তৃণমূল সরকারও জর্জরিত। ধনীর স্বার্থরক্ষাকারী প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনীতি সেই সমস্যাকে প্রতিদিন আরও গভীরতর করে তুলছে। বাঁচার কোনও পথ কেউ দেখাতে পারছে না। তাই যেখানে পারছেন যা খুশি তাই বলে সমস্যাকে ধামাচাপা দেওয়ার মিথ্যা চেষ্টা করছেন নেতা-মন্ত্রীরা। গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় প্রতিটি জনসভায় ডবল চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নেতাজি ইন্ডোরের সভায়, খড়্গপুরের বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে রাজ্য সরকার লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। দেশে যখন প্রবল বেকারত্ব তখন নাকি তাঁর শাসনে রাজ্যে বেকারত্ব ৪০ শতাংশ কমে গেছে এবং আগামী ৪-৫ বছরে রাজ্যকে কর্মসংস্থানে তিনি এক নম্বরে নিয়ে যাবেন। রাজ্যে যদি বেকারত্ব কমেই থাকে, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ কর্মসংস্থানে এক নম্বর হয় তা হলে আইটিআই ও কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত যুবকদের চাকরির সুলুক সন্ধান না দিয়ে চা, ঘুগনি তেলেভাজা বিক্রির পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রী কেন দিলেন?

একদিকে রাজ্যে চাকরির নিয়োগের ব্যাপক দুর্নীতি প্রকাশ্যে চলে আসা, কোটি কোটি টাকা উদ্ধার, দুর্নীতিতে জড়িত দলের নেতা-মন্ত্রী ও বশংবদ আমলাদের গ্রেপ্তারি, অন্যদিকে মেধা তালিকাভুক্তদের লাগাতার আন্দোলনে সরকার নাজেহাল। দীর্ঘবছর ধরে সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধ। পিএসসি, এসএসসি-সহ সমস্ত সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগের দাবিতে প্রতিদিন রাস্তার আন্দোলনে বেকার যুবক-যুবতীরা। এই পরিস্থিতিতে দ্রুততার সাথে কলকাতা ও খড়্গপুরে দুটি সভায় রাজ্যের হাজার হাজার বেকারকে ডেকে চাকরির নিয়োগপত্র হাতে ধরিয়ে চালাকির আশ্রয় নিয়ে বাজিমাত করতে চেয়েছিল তৃণমূল সরকার। কিন্তু সে কৌশল সফল হয়নি। আসলে চালাকির দ্বারা যে কোনও দিন কোনও ভাল কাজ হয় না— এই আপ্তবাক্যটি মুখ্যমন্ত্রী ভুলে গেছেন। এই অপ্রয়োজনীয় কাজটি না করে সরকারের উচিৎ উৎসবের আগে সমস্ত পরীক্ষার মেধা তালিকাভুক্তদের নিয়োগপত্র দেওয়া এবং সমস্ত শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগের নোটিফিকেশন জারি করা। কোর্টও বলে দিয়েছে নিয়োগে কোনও বাধা নেই। তা হলে গড়িমসি কেন?

বর্তমানে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি যুবকের বাস এই ভারতবর্ষে। অথচ সেই যুবকদের নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা বা পরিকল্পনা—কি কেন্দ্র, কি রাজ্য—কোনও সরকারেরই নেই। কাজ নেই তা তো নয়। দিল্লির কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলিতে প্রধানমন্ত্রীর চোখের সামনে নয় লক্ষ এগারো হাজার শূন্যপদ। শুধুমাত্র দিল্লির কেন্দ্রীয় দপ্তরে যদি এত শূন্যপদ হয় তা হলে সমগ্র দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা দপ্তরে শূন্যপদ কত তা সহজেই অনুমেয়। একই অবস্থা পশ্চিমবঙ্গেরও। রাজ্যে শুধুমাত্র শিক্ষক পদ ফাঁকা তিন লক্ষাধিক। রাজ্যের বাকি দপ্তরগুলির শূন্য পদের সংখ্যা যদি ধরা হয় তা হলে কয়েক লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান যে সম্ভব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ তা না করে হয় পদ তুলে দেওয়া হচ্ছে, না হয় কাটমানি নিয়ে অথবা ঠিকার ভিত্তিতে নিয়োগ হচ্ছে। এমনকি সেনাবাহিনীতেও স্থায়ী নিয়োগে কোপ পড়েছে।

কেন এমন হচ্ছে? এমনিতেই পৃথিবীর প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের মতো ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থারও বেহাল দশা। উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ মজুত থাকলেও শিল্পপতিরা নতুন কলকারখানা খোলা দূরে থাক, একের পর এক সেগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে। কারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেই। ফলে দেশ জুড়ে বিপুল ভাবে বাড়ছে বেকারত্ব। এই অবস্থায় সরকারি দফতর ও স্কুল-কলেজগুলির শূন্যপদ নিয়মিত ভাবে পূরণ করলে এই বিরাট সংখ্যক কর্মহীন মানুষের একটি অংশের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফা-ভাণ্ডার ভরিয়ে তোলার কাজে নিবেদিতপ্রাণ সরকারগুলি খনি, বন্দর, বিমানবন্দর সহ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে দিচ্ছে তাদের হাতে। কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছে সাধারণ মানুষের প্রতি দায়দায়িত্ব। তাই সরকারি দফতরে নিয়োগে তাদের উদ্যোগ নেই। নিয়োগ করলেও তা চলছে ঠিকা ব্যবস্থায়, যাতে কর্মীর পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের দায়িত্ব সরকারকে না নিতে হয়। পাশাপাশি পুঁজিপতিদের শিক্ষা-ব্যবসায় মুনাফা-লুটের সুযোগ করে দিতে সরকারি বা সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজগুলিকে দুর্বল করে দেবার অপচেষ্টা চালাচ্ছে সরকারগুলি। তাই নিয়োগ নেই স্কুল-কলেজেও।

এই অবস্থায় কর্মসংস্থানের যেটুকু সুযোগ এখনও আছে, তা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে সরকারকে বাধ্য করা প্রয়োজন। ফলে অবিলম্বে শূন্যপদে নিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থার দাবিতে সংগঠিত লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া কর্মপ্রার্থীদের বাঁচার পথ নেই।

জীবনাবসান

পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহর লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড হিরণ্ময় ঘোষ ৩ সেপ্টেম্বর দুরারোগ্য ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। কমরেড হিরণ্ময় ঘোষ আশির দশকের ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সাথে যুক্ত হন। সেই সময় বর্ধমান রাজ কলেজ এবং পরে শ্যামসুন্দর কলেজে এসএফআই-এর হাতে মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হয়েও এআইডিএসও সংগঠন গড়ে তোলার কাজ নিরলসভাবে চালিয়ে গেছেন। সাংসারিক অভাব অনটনও পার্টির কাজকর্মের ক্ষেত্রে কখনওই খুব একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারেনি। কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শকে হৃদয় দিয়ে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বুর্জোয়া সংস্কৃতির কুপ্রভাবের বিরুদ্ধে তিনি নিরলস সংগ্রাম করেছেন। দলের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আস্থা ও ভালবাসা। বিন্দুমাত্র ক্ষতি বা বিপদের সম্ভাবনা থেকে দলকে রক্ষা করেছেন। শান্ত স্বভাব, দরদি মন, গরিব মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা থেকে কমরেড হিরণ্ময় ঘোষ এলাকার মানুষের আপনজনে পরিণত হতে পেরেছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও দল এবং সামাজিক কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল।

কমরেড হিরণ্ময় ঘোষ লাল সেলাম

মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া পূর্ব লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড ডলি মণ্ডল দীর্ঘ রোগভোগের পর ২ সেপ্টেম্বর নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।

একটি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের সন্তান কমরেড ডলি মণ্ডল নব্বইয়ের দশকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। তিনি প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ বেশি না পেলেও সমাজ ও আত্মীয় স্বজনদের রক্ষণশীল মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে দলের কাজ শুরু করেন। একজন মহিলা হিসাবে তাঁর কাজ এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে। সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় তিনি দলের আবেদনকারী সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। একসময় এআইএমএসএস-এর হরিহরপাড়া পূর্ব লোকাল কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সহজ সরল অথচ দৃঢ় চরিত্র মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং তিনি দলের একজন জনপ্রিয় কর্মী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দল এবং এলাকার সাধারণ মানুষ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও সংগ্রামী একজন মানুষকে হারাল। ১১ সেপ্টেম্বর হরিহরপাড়ার চোঁয়াতে প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড ডলি মণ্ডল লাল সেলাম

রাষ্ট্রপতির উচ্চাসনে যিনিই বসুন

দলিত-আদিবাসীদের চোখের জল তাতে ঘোচে না

প্রধানমন্ত্রী কথিত স্বাধীনতার অমৃতকালের ভোর হওয়ার আগেই ১৪ আগস্ট শেষনিঃশ্বাস ফেলে বিদায় নিয়েছে রাজস্থানের স্কুল ছাত্র ৯ বছরের ইন্দ্র মেঘওয়াল। তথাকথিত 'নিচু' জাতের ছেলে হয়েও স্কুলে 'উঁচু' জাতের জন্য রাখা জলের কলসি ছুঁয়ে ফেলার অপরাধে 'উচ্চবর্ণের' শিক্ষকের মারে প্রাণ দিতে হয়েছে তাকে।

১৬ আগস্ট উত্তরপ্রদেশে স্কুলের ২৫০ টাকা ফি দিতে না পারায় 'উচ্চবর্ণের' শিক্ষকের মারে প্রাণ হারিয়েছে তথাকথিত 'নিচু' জাতভুক্ত ১৩ বছরের ব্রিজেশ কুমার। এমন ঘটনার শেষ নেই ভারতে। উত্তরপ্রদেশের হাথরস, লখিমপুর, খেরি, গুজরাটের উনা, হরিয়ানার হিসার, কর্ণাটকের শান্তিপুরা সহ ভারতের নানা জায়গায় কখনও তথাকথিত উচ্চবর্ণের ক্ষমতাশালীদের হাতে, কখনও বিজেপি-আরএসএস এবং তাদের ঘনিষ্ঠ বজরঙ দলের মতো উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হাতে নিগৃহীত এমনকি নিহত হচ্ছেন দলিত এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। অথচ ঠিক এই সময়েই আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হলেন। প্রধানমন্ত্রী এবং তার দল বিজেপি প্রচার করছে একজন আদিবাসী জনজাতিভুক্ত মানুষের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়া একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

কিন্তু এটা বিশেষ এবং ব্যতিক্রমী ঘটনা কেন? দ্রৌপদী মুর্মু একজন ভারতীয় নাগরিক, স্বচ্ছল পরিবারে জন্মের সুবাদে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন, বিজেপির প্রতিনিধি হিসাবে কাউন্সিলর থেকে এমএলএ এমনকি রাজ্যপাল হওয়ার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। বর্তমানে তাঁর দল বিজেপির সাংসদ ও এমএলএ মিলিয়ে যা সংখ্যা তাতে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে এই জয় খুব স্বাভাবিক। তা হলে এই ঘটনা ব্যতিক্রমী কেন? তিনি আদিবাসী পরিবারের সন্তান বলেই কি? অর্থাৎ স্বাধীনতার পর ৭৫ বছর ধরে এ দেশের নানা রঙের সরকারি দলগুলি যে শাসন চালিয়েছে, তাতে একজন আদিবাসী জনজাতিভুক্ত মানুষের উচ্চপদে নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টা আজও ব্যতিক্রমী ঘটনা হয়েই আছে! সে জন্যই বোধহয় প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল বিজেপি প্রচার করছে, দেখ, আমাদের বদান্যতায় একজন আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতি হতে পারলেন! কিন্তু এ জন্য তাঁদের বিশেষ বদান্যতার প্রয়োজন হল কেন? এই প্রচারই তো প্রমাণ করে দেয় আদিবাসী মূলবাসী জনজাতিভুক্ত মানুষের উচ্চপদে আসীন হওয়ার বিষয়টিকে শাসকরা কোন চোখে দেখে!

প্রচার করা হচ্ছে, দ্রৌপদীজি রাষ্ট্রপতির আসনে বসায় এ দেশের অবহেলিত বঞ্চিত আদিবাসী জনগণ বিকাশের শক্তি লাভ করলেন। পাঁচ বছর আগে যেমন বিজেপি প্রচার করেছিল, রামনাথ কোবিন্দ রাষ্ট্রপতি হওয়ায় দলিতদের প্রতি বঞ্চনা দূর হয়ে যাবে। অথচ বাস্তব তথ্য বলছে বিজেপি শাসনেই দলিত এবং আদিবাসী জনগণের উপর আক্রমণ, তাদের অবমাননা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। শুধু ২০২০-তেই দলিতদের উপর অত্যাচার এবং অবমাননার ৫০ হাজারের বেশি অভিযোগের কোনও বিচার হয়নি। ২০১১-'২০ এই ১০ বছরে আদিবাসীদের উপর হামলার ৭৬ হাজার ৮৯৯টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোতে। তথাকথিত উচ্চবর্ণ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের সমর্থক বিজেপি-আরএসএস-এর আদর্শ বলে, ব্রাহ্মণরাই শ্রেষ্ঠ, শূদ্রের জন্মই উচ্চবর্ণের সেবার জন্য। তাদের এই সেবক তালিকায় যেমন দলিতরা আছেন, তেমনই আদিবাসী সম্প্রদায়ও আছেন। আরএসএস শুরু থেকেই বর্ণহিন্দুদের শ্রেষ্ঠ বলে মেনেছে। তাদের গুরুজি গোলওয়ালকর চেয়েছিলেন মনুসংহিতাকেই ভারতের সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করতে। মনুসংহিতার বিধান হল, শূদ্রের জন্মই উচ্চবর্ণের সেবার জন্য। সেই বিধানকে মানলে গোলওয়ালকারের শিষ্য আরএসএস-বিজেপি, দলিত এবং আদিবাসীদের কোন মর্যাদা দেবে? আদিবাসী সমাজ বহু যুগ ধরে প্রকৃতির উপাসনাকেই স্বাভাবিক ধর্ম হিসাবে মেনে এসেছে। কোনও হিন্দু দেবদেবীর উপাসনার চল তাদের মধ্যে নেই। 'সারনা' ধর্মের জন্ম এখান থেকেই। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের ঘৃণা ও অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে তাদের অনেকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আরএসএস-এর বিধান হল এদের সকলকেই হিন্দু উপাসনার রীতিতে ফিরতে হবে। বিজেপি সেই বিধানকে মেনে চলে। যে কারণে আরএসএস-বিজেপি বহু রাজ্যে আদিবাসীদের হিন্দুত্বের পাঠ দেওয়ার শিবির করছে। এই পথ ধরেই বজরঙ দলের মতো বিজেপি ঘনিষ্ঠ নানা শক্তি বারে বারে আদিবাসীদের উপাসনাস্থল এবং গির্জার উপর হামলা চালিয়েছে। এর পরেও বিজেপির হাতে আদিবাসী জনগণের সংস্কৃতি, ভাষা, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হতে পারে?

বিজেপি মনোনীত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ইতিহাসও বলে, আদিবাসী ঘরে জন্ম হলেও তিনি কোনও দিন আদিবাসী, দলিত, জনজাতিদের অধিকার রক্ষায় একটি শব্দও ব্যয় করেননি। তিনি বিজেপির টিকিটে কাউন্সিলর, এমএলএ, ওড়িশা রাজ্যের মন্ত্রী এবং ঝাড়খণ্ডের মতো আদিবাসী অধ্যুষিত রাজ্যের রাজ্যপাল হয়েছেন। কিন্তু সরকার জঙ্গল-কৃষিজমি থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদের চেষ্টা যখনই করেছে তিনি হয় নীরব দর্শক অথবা তার সমর্থক হয়ে থেকেছেন। তিনি ময়ূরভঞ্জ জেলার রাইরাঙপুরে বিজেপির কাউন্সিলর থাকাকালীন ওই জেলায় খনি মাফিয়ারা আদিবাসীদের জমি দখল করে আদিবাসী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার, গুমখুন চালিয়েছে। তিনি কোনও দিন প্রতিবাদ করেছেন বলে কারও জানা নেই। ২০০২ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকার আদিবাসীদের জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নেওয়ার আইন করলে তিনি ছিলেন তার সমর্থক। তিনি মন্ত্রী থাকাকালীনই ওড়িশায় বিজেপি-বিজেডি জোট সরকার কলিঙ্গনগরে আদিবাসীদের জমি, জঙ্গল টাটা কোম্পানির স্বার্থে জোর করে অধিগ্রহণ শুরু করে। প্রতিরোধ আন্দোলনে ২০০৬-এর জানুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে ১৩ জন আদিবাসী মানুষ প্রাণ হারান। পরে বিজেপি জোট সরকার এই হত্যার জন্য পুলিশের প্রশংসা করে। দ্রৌপদীজি এর বিরুদ্ধে কখনও মুখ খুলেছেন? তিনি ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল থাকাকালীন বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার ছোটনাগপুর টেনেন্সি অ্যাক্ট এবং সাঁওতাল পরগণা টেনেন্সি অ্যাক্টকে দুর্বল করে দিয়ে আদিবাসীদের জমি যথেচ্ছ ভাবে কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠলে ১০ হাজার আদিবাসীর উপর রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে মারাত্মক অভিযোগ আনে বিজেপি সরকার। পরবর্তীকালে আন্দোলনের চাপে এই আইন নিয়ে বিজেপি আর এগোতে সাহস করেনি। ফলে তাঁকেও সে আইনে আর সই করতে হয়নি। দ্রৌপদীজির ভূমিকা এক্ষেত্রেও ছিল সরকারের অনুগত সৈনিকের মতোই। সম্প্রতি বিজেপি সরকার জঙ্গলের অধিকার আইন ২০০৬-কে দুর্বল করে দিয়ে জঙ্গলের জমি শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার আগে সেখানে বসবাসকারী আদিবাসী, মূলবাসী, জনজাতিদের মতামত নেওয়ার শর্ত বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে লক্ষ লক্ষ পরিবার যারা বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে, তারা বিপদগ্রস্ত হবে। রাষ্ট্রপতির আসন থেকে এই চরম অন্যায়ের প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়ার আশা কি কেউ করতে পারবেন?

পাঁচ বছর আগে রামনাথ কোবিন্দকে রাষ্ট্রপতির আসনে বসানোর সময় তাঁর দলিত পরিচয়কে তুলে ধরে দলিত স্বার্থের চ্যাম্পিয়ন সেজেছিল বিজেপি। তাতে দলিতদের কী উপকার হয়েছে? এই সময়কালেই কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে দলিতদের সুরক্ষা আইনকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। তাঁর সময়কালেই উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে দলিত নির্যাতন বেড়েছে। উত্তরপ্রদেশের হাথরসে দলিত কন্যাকে ধর্ষণ করে হত্যার মর্মান্তিক ঘটনার পর বিচার দূরে থাক বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের পুলিশ ব্যস্ত থেকেছে রাতের অন্ধকারে তার দেহকে পুড়িয়ে প্রমাণ লোপাট করে দেওয়ার কাজে। বিজেপি রাজত্ব দলিতদের উপর অত্যাচারের অন্যতম কালো অধ্যায় হয়ে আছে। রামনাথ কোবিন্দকে রাষ্ট্রপতির চেয়ারে খাড়া করে রেখে বিজেপি সরকার সুপ্রিম কোর্টকে হাতিয়ার করে 'তফসিলি জাতি-উপজাতি নিগ্রহ প্রতিরোধ আইন' দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ তার প্রতিবাদে আন্দোলনে নামলে ২০১৮-র ২ এপ্রিল পুলিশ গুলি করে ১১ জনকে হত্যা করে। ওই বছরই তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হংসরাজ গঙ্গারাম আহির রাজ্যসভায় তথ্য দিয়ে জানিয়েছিলেন, এই আইনে নথিভুক্ত বেশিরভাগ মামলার বিচার আদৌ শুরুই হয়নি। রাষ্ট্রপতির আসন থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া কিন্তু মেলেনি।

ভারত সরকারের সর্বশেষ হাউসহোল্ড সার্ভে জানাচ্ছে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ৪০.৬ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে। ৪২ শতাংশ আদিবাসী শিশু অপুষ্টির শিকার, শিশুমৃত্যুতে সমস্ত সম্প্রদায়ের তুলনায় আদিবাসীদের হার বেশি। মেঘালয়ের মতো রাজ্যে ৭৬ শতাংশ আদিবাসী শিশু অপুষ্ট। টিবি, ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সর্বাধিক। বিগত ১০ বছরে অর্থাৎ মূলত বিজেপি শাসনে মোট আদিবাসী জনসংখ্যার ৫০ শতাংশই তাঁদের স্বাভাবিক বসবাসের স্থান থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন।

ভারতের মতো একটা শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, যা ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে, তেমন একটি রাষ্ট্রের উচ্চাসনে কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতিগোষ্ঠীভুক্ত কাউকে বসিয়ে দিলেই কি সেই সম্প্রদায় বা জাতিগোষ্ঠীর উন্নতি হতে পারে, না হওয়া সম্ভব? পুঁজিবাদী শাসনে খেটে খাওয়া সমস্ত অংশের মানুষই শোষিত-নিপীড়িত। এর মধ্যেও দীর্ঘদিন সামাজিক বঞ্চনা ও শোষণের শিকার আদিবাসী, দলিত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বড় অংশের দরিদ্র মানুষ যে তীব্রতায় শোষণ-যন্ত্রের নিপীড়ন ভোগ করেন তা আরও মারাত্মক। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে এমনিতেই আধিপত্যকারী গোষ্ঠী দুর্বলদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তথাকথিত উচ্চবর্ণের যে অংশ অপেক্ষাকৃত অধিকতর সম্পদের মালিক হয়ে বসে আছে, তাদের দাপটে স্বাধীন ভারতেও ভাষাগত, সম্প্রদায়গত-জাতিগতভাবে অপেক্ষকৃত দুর্বল গোষ্ঠীর মানুষ সঙ্কুচিত হয়ে থাকেন। এ দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যেও তথাকথিত উচ্চবর্ণজাত হিন্দুদের প্রতিপত্তির প্রভাব অন্যদের দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস নেতাদের অধিকাংশই এই তথাকথিত উচ্চবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্যের অধিকারের ধারণায় আচ্ছন্ন ছিলেন। কংগ্রেসের এই দুর্বলতাই বিজেপি-আরএসএসের উগ্র হিন্দুত্ববাদের উত্থানের জমি তৈরি করে দিয়েছে। অন্যদিকে দলিত এবং আদিবাসী অধিকারের ধুয়ো তুলে একদল ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ নিজেদের আখের গুছিয়েছেন। তাঁরা শোষিত মানুষের সামগ্রিক ঐক্যের কথা না বলে দলিত, সংখ্যালঘু আদিবাসী অধিকারের চ্যাম্পিয়ন সেজেছেন। দলিত এবং আদিবাসীদের জন্য যে সমস্ত সুবিধার কথা শাসকদলগুলি প্রচার করে থাকে, তার ফলে খুব বেশি হলে এই অংশের মানুষের ৩ শতাংশ লাভবান হয়েছেন। যারা সুযোগ পেয়েছে তারাই পরম্পরাগতভাবে সুবিধা ভোগ করে চলেছে। এই সুবিধাভোগী অংশের কিছু মানুষকে শাসক শ্রেণি কাজে লাগায় অধিকাংশ বঞ্চিত, দরিদ্র, প্রান্তিক মানুষকে দাবিয়ে রাখতে। এরা কেউ কেউ মন্ত্রী হন, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিও হতে পারেন, কিন্তু তাতে শোষিত আদিবাসী, দলিত, অন্যান্য অংশের খেটে খাওয়া মানুষের উপকার হওয়া দূরে থাক, এই সুবিধাভোগীরা পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস হয়ে নির্মম শোষণ চালানোর হাতিয়ারে পরিণত হন। এর ফলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত খেটে খাওয়া নিপীড়িত মানুষের ঐক্যের সম্ভাবনায় চিড় ধরে।

দলিত-আদিবাসী জনগণের এই যে দুটি মূল সমস্যা—একদিকে পুঁজিবাদী শোষণ, অন্যদিকে উচ্চজাতিসমূহের আধিপত্য— কোনও দলিত-

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিকিমে অন্যায় গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা এআইইউটিইউসি-র

দক্ষিণ সিকিমের অ্যালকেম ল্যাবরেটরির চুক্তি শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরির দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। তাঁদের এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানায় সিকিম প্রোগ্রেসিভ ইউথ ফোরাম। ১৩ সেপ্টেম্বর সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে ফোরামের তিন সদস্য রুপেন কার্কি, লেখক শর্মা এবং প্রবীণ বাসনেতকে সিকিম পুলিশ অন্যায় ভাবে গ্রপ্তার করে এবং থানায় আটক করে রাখে। এর তীব্র নিন্দা করে এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ১৪ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, কোনও কারণ না দেখিয়েই এই গ্রেপ্তার এবং থানায় সারা রাত আটক করে রাখা নাগরিকের মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ এবং তা আইনি বিচারের নিয়মবিরুদ্ধ।

তিনি সিকিমের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে শ্রমিকদের এই ন্যায্য এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানান।

ঝাড়খণ্ডে ছাত্র আন্দোলনের জয়

ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার ঘাটশিলা কলেজে ২০২১-'২২ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষের ৭০ জন ছাত্র পরীক্ষায় বসার জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দেয়। কিন্তু পরীক্ষার আগে অ্যাডমিট কার্ড নিতে গিয়ে ছাত্ররা দেখে তাদের নাম নথিভুক্তই হয়নি। ক্ষুব্ধ ছাত্ররা এআইডিএসও-র নেতৃত্বে টানা দু'মাস কলেজ কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় বিধায়ক এবং মন্ত্রীর দরবারে আন্দোলন সংগঠিত করেন। দাবি আদায় না হওয়ায় এআইডিএসও কলেজ ইউনিট অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনের ডাক দেয়। ২ দিন অনশন চলার পর ছাত্রছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে এসডিও-র হস্তক্ষেপে কলেজ কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। নেতৃত্ব দেন কলেজ কমিটির সম্পাদক সুবোধ কুমার মহালি।

পঞ্চায়েত দপ্তরে কর আদায়কারীদের ডেপুটেশন

১৪ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে নদীয়া জেলা পঞ্চায়েত হয়। জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কর আদায়কারীরা এসে কৃষ্ণনগর এসডিও সদরে

ডিপিআরডিও (পঞ্চায়েত আধিকারিক)-র কাছে দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলির সাথে ডিপিআরডিও সহমত জানান। নেতৃত্ব দেন বলরাম সাঁতরা, অভিজিৎ ঘোষ, শুভেন্দু মণ্ডল, আধিকারিকের কাছে কর আদায়কারীদের বিভিন্ন দাবিতে ডিপিআরডিও-র কাছে স্মারকলিপি দেওয়া আলামিন মণ্ডল ও ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক দেবাশীষ ব্যানার্জী।

ব্যাঙ্কের কন্ট্রাক্ট কর্মীদের আন্দোলনের জয়

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ভেন্ডার পি ভি এস কোম্পানি মালদা রিজিয়নের সকল সিকিউরিটি গার্ডকে অন্যায় ভাবে দূরে বদলির নির্দেশ দেয়।

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম (সিবিইইউএফ) -এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ভেন্ডর এবং ব্যাঙ্ককে চিঠি দিয়ে এই অন্যায় নির্দেশ তুলে নেওয়ার দাবি জানায়। বদলির প্রতিবাদে ১৫ সেপ্টেম্বর মালদার ওই ব্যাঙ্কের রিজিওনাল অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। আন্দোলনের চাপে ভেন্ডার বদলির আদেশ তুলে নিতে বাধ্য হয়। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন অংশুধর মণ্ডল, গোপাল দেবনাথ, গোবিন্দ পাল, অমৃত বর্মন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ পোদ্দার আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য সকল কর্মীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এআইডিএসও-র কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাগার উদ্বোধন

৮ সেপ্টেম্বর ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের বলিষ্ঠ যোদ্ধা, চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট নেতা, সাংবাদিক ও লেখক জুলিয়াস ফুচিকের স্মরণদিবসে এআইডিএসও-র কেন্দ্রীয় দপ্তরে সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে 'শহিদ জুলিয়াস ফুচিক স্মৃতি পাঠাগার'-এর উদ্বোধন করেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশংকর পট্টনায়ক। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি কমরেড সামসুল আলম সহ জেলা নেতৃবৃন্দ। আগামী দিনে বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনের গতিধারায় এই পাঠাগার অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করুক এই আশা ব্যক্ত করেন নেতৃবৃন্দ।

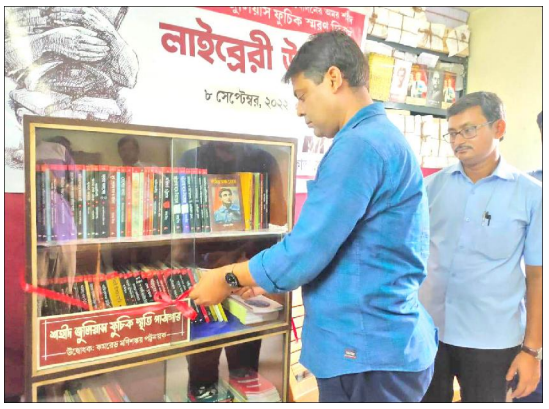

ডেঙ্গু রোধের দাবিতে আন্দোলন

ডেঙ্গু প্রতিরোধে দ্রুততার সাথে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, জীবনদায়ী ৮০০টি ওষুধের অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধি প্রতিরোধ, সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধ ছাঁটাই বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে সমস্ত রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা সহ জেলার সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালের শূন্যপদে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের দাবিতে ১৫ সেপ্টেম্বর সারা বাংলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে জেলাশাসক, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও জেলা হাসপাতালের সুপারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডাঃ সন্তোষ মাইতি, ডাঃ জয়দেব ঘড়া, ডাঃ রামচন্দ্র সাঁতরা, দীপক জানা, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক প্রমুখ।

এই দাবিতে তমলুক হাসপাতাল মোড়ে বিক্ষোভ অবস্থান ও মিছিল হয়। শতাধিক নাগরিক এই কর্মসূচিতে যোগ দেন।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কনভেনর ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পরিচালনা করেন সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক প্রণব মাইতি।

হলদিয়ায় পরিচারিকাদের বিক্ষোভ

হলদিয়ার বিষ্ণুরামচকে পঞ্চমী দাস ও ভানু মিদ্যা পরিচারিকার কাজ করতেন স্থানীয় এক শিক্ষিকার বাড়িতে। ১৩ সেপ্টেম্বর কাজ করতে গেলে চুরির অপবাদে তাঁদের পুলিশ ফাঁড়ি, পরে থানায় নিয়ে যায় বাড়ির লোক এবং মারধোর করে পুলিশ।

প্রতিবাদে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির হলদিয়া শাখার নেতৃত্বে ১৫ সেপ্টেম্বর পরিচারিকাদের নিয়ে পুলিশ ফাঁড়ি ও চিরঞ্জীবপুর থানায় তুমুল বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে পুলিশ তাঁদের ছেড়ে দেয়।

এই জঘন্য আচরণের জন্য দোষী পুলিশ ও মালিকপক্ষের উপযুক্ত শাস্তি এবং পরিচারিকাদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ১৮ সেপ্টেম্বর দুই শতাধিক পরিচারিকা ফাঁড়িতে বিক্ষোভ দেখান। অবশেষে পুলিশ ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং পরিচারিকাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নেয়। নেতৃত্ব দেন সমিতির নেত্রী অসীমা পাহাড়ী ও অঞ্জলি মান্না।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে দোকানদার কল্যাণ সমিতির সম্মেলন

পুনর্বাসন ছাড়া দোকানদার ও বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ না করা, আরপিএফ-এর হয়রানি এবং টাকা তোলা বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে দোকানদার কল্যাণ সমিতির পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৫ সেপ্টেম্বর কোলাঘাটে। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি শশাঙ্ক শেখর মাইতি।

বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা হকার্স ইউনিয়নের সভাপতি মধুসূদন বেরা, সাধারণ সম্পাদক শান্তি ঘোষ, শঙ্কর মালাকার, গোপাল মাইতি এবং অধ্যাপক জয়মোহন পাল, সুব্রত দাস। চার শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। শশাঙ্ক শেখর মাইতিকে সভাপতি ও গোপাল মাইতিকে সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠিত হয়।

রাজ্যে রাজ্যে ছাত্র সম্মেলন

সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল এবং জনতার ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচাতে এআইডিএসও-র আহ্বানে দেশব্যাপী চলমান আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন রাজ্যে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল।

ওড়িশা ঃ ১০-১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল একাদশতম ওড়িশা ছাত্র সম্মেলন (উপরের ছবি)। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেই আজাদ হিন্দ ফৌজের শতাধিক সৈনিকের জন্মভূমি গঞ্জাম শহরে রাজ্যের প্রান্ত প্রত্যন্ত থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু নামাঙ্কিত কালিকট বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানের প্রকাশ্য অধিবেশনে যোগ দেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড ভি এন আর শেখর, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুভাষ নায়েক।

শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ বাণিজ্যিকীকরণ সাম্প্রদায়িকীকরণের ফ্যাসিবাদী আক্রমণের পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষানীতিরই পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্লোজার মার্জার নীতির কারণে সারা দেশের মতো এই রাজ্যেও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক স্কুল, শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পঠন-পাঠন। ক্ষমতাসীন বিজেডি, পুলিশ, শিক্ষা মাফিয়াদের আক্রমণকে প্রতিহত করে এআইডিএসও-র উদ্যোগে গড়ে উঠেছে প্রতিরোধ আন্দোলন ও আন্দোলনের হাতিয়ার বিদ্যালয় সুরক্ষা কমিটি।

উৎকলমণি গোপবন্ধু দাস মঞ্চে (সংস্কৃতি ভবন) ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল প্রতিনিধি অধিবেশন। সাত শতাধিক প্রতিনিধি এই অধিবেশনে অংশ নেন।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড গণেশ ত্রিপাঠী। সম্মেলন থেকে কমরেড সোমনাথ বেহেরাকে সভাপতি ও কমরেড সিদ্ধার্থ রথকে সম্পাদক নির্বাচন করে ১৩৪ সদস্যের শক্তিশালী রাজ্য কাউন্সিল নির্বাচিত হয়।

তেলেঙ্গানা ঃ ১৬ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদ শহরের ভগৎ সিং মঞ্চে (সারস্বত পরিষদ হল) এআইডিএসও-র আহ্বানে অনুষ্ঠিত হল প্রথম তেলেঙ্গানা রাজ্য ছাত্র সম্মেলন (নীচের ছবি)।

রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সমা মারলা, প্রসিদ্ধ উর্দু সংবাদ সংস্থা সিয়াসতের প্রধান সম্পাদক জহিরউদ্দিন আলি খান, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাগেশ্বর রাও। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা শিক্ষার নানা সমস্যা নিয়ে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। সমাপ্তি ভাষণ দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড ভি এন আর শেখর।

সম্মেলন থেকে কমরেড মল্লেশ রাজকে সভাপতি এবং কমরেড সত্যনারায়ণকে সম্পাদক করে ৫৩ সদস্যের তেলেঙ্গানা রাজ্য কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আর গঙ্গাধর।

বাঙ্গালোরে বন্যা ঃ উন্নয়নের নামে যথেচ্ছাচারের পরিণতি

কর্ণাটকের রাজধানী, তথ্যপ্রযুক্তির স্বর্গরাজ্য হিসাবে কথিত বাঙ্গালোরের জলমগ্ন ছবি কয়েকদিন ধরে সারা দেশের মানুষ দেখেছে। এসইউসিআই(সি)-র বাঙ্গালোর জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড এম এন শ্রীরাম ৬ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, অসাধু প্রোমোটারদের সাথে শাসকদের আঁতাতের ফলে উন্নয়নের নামে যথেচ্ছভাবে লেক, প্রাকৃতিক নালা ইত্যাদি জলাশয় বোজানো হয়েছে, গাছ কেটে ও অন্যভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংস করা হয়েছে। তার ফল ভোগ করছে আজ বাঙ্গালোরবাসী। তিনি দাবি করেন, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার ও শহরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং উন্নয়নের নামে যথেচ্ছাচার বন্ধ করতে হবে।

গুজরাটে নির্মাণকর্মীদের মৃত্যু চলছেই

নিরাপত্তার দাবি এআইইউটিইউসি-র

গুজরাটের সুরাটে ১৪ তলা থেকে পড়ে ১৬ সেপ্টেম্বর দুই নির্মাণ কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এর দু'দিন আগে আহমেদাবাদে নির্মীয়মান বাড়ি ধসে সাত জন শ্রমিক মারা যান এবং এক জন গুরুতর আহত হন। বিপজ্জনক রাসায়নিক কারখানা ও নির্মাণ ক্ষেত্রে বহুতলে কাজ করার সময় কর্তৃপক্ষ এই নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়াই কাজে নিয়োগ করে। দুর্ঘটনায় একের পর এক শ্রমিকের মৃত্যুর পরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে না কারখানা কর্তৃপক্ষ। রাজ্যে বিজেপি সরকারেরও কোনও নজরদারি নেই।

এআইইউটিইউসি-র গুজরাট রাজ্য কনভেনর তপন দাশগুপ্ত কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান দপ্তরের মন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে এই সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের উপযুক্ত নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গুজরাটে শ্রমিকদের নিরাপত্তা 'টাইম বোমের' উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ করে নির্মাণ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য নিরাপত্তা পরিদর্শক, নিরাপত্তার ট্রেনিং এবং নিরাপত্তা সরঞ্জাম দেওয়ার সাথে সাথে দুর্ঘটনাগুলির তদন্ত করে মৃতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান।

দলের ঝাড়খণ্ড রাজ্য শিক্ষাশিবির

২-৪ সেপ্টেম্বর ঘাটশিলাতে অনুষ্ঠিত হল পার্টির ঝাড়খণ্ড রাজ্য শিক্ষা শিবির। বক্তব্য রাখেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ ও কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। পার্টির ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক পলিটবুরো সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি ক্লাস সঞ্চালন করেন। মার্ক্সবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-এর বিভিন্ন দিক, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিপ্লবী কর্মীদের কর্তব্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। গ্রুপ ডিসকাশনে রাজ্যের কমরেডরা বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন।

সরকার কালোবাজারি-মজুতদারিতে মদত দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে দিচ্ছে

অন্ধ্রপ্রদেশে এআইকেকেএমএসের সম্মেলনে বললেন প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী

'সরকার কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দিতে অস্বীকার করছে, কিন্তু কালোবাজারি ও মজুতদারিতে মদত দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে দিচ্ছে'— অন্ধ্র প্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় এআইকেকেএমএস আয়োজিত কৃষক সম্মেলনে এ কথা বলেন, রাজ্যের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী ভি এস রাও। ৯ সেপ্টেম্বর সংগঠনের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি। তিনি বলেন, যদি এমএসপি (ন্যূনতম সহায়ক মূল্য)-র দাবি আদায় না হয় তাহলে কৃষক পরিবার ও তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ। তিনি দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের শিক্ষাগুলি তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের তেলেঙ্গানা রাজ্য সম্পাদক সি এইচ প্রমীলা, সর্বভারতীয় সহ সভাপতি রঙ্গস্বামী এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বি এস অমরনাথ। সম্মেলনে এম গিরীশকে সভাপতি, ওয়াই এম রেড্ডি এবং এস এ খাদারকে সহ সভাপতি, নাগা মুথিয়ালুকে সম্পাদক এবং রঙ্গনরাকুলুকে কোষাধ্যক্ষ করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

শুধু হাত-পা ছুঁড়লে বা বিক্ষোভ থেকে বিপ্লব জন্ম নেয় না

একের পাতার পর

বুর্জোয়ারা শুধু রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে বাইরে থেকে বিপ্লবী আন্দোলনকে আঘাত করে না, বুর্জোয়া সমাজের অপসংস্কৃতি, আচার-আচরণ, তার অবক্ষয়িত নীতি-নৈতিকতার ধারণা এই চোরাগলির পথে অভ্যাসের রূপে ভিতরে গিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে নষ্ট করে দেয়, নীতিভ্রষ্ট এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয়। কাজেই এই জিনিসটির প্রতি আমাদের লক্ষ রাখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে যে বিষয়টা প্রশ্ন হিসাবে আপনাদের অনেকের মধ্যে দেখা দিয়েছে—অর্থাৎ আমাদের দেশের রেনেসাঁস আন্দোলন সমাজজীবনে বেশিদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি কেন, তা নিয়ে আমি খানিকটা আলোচনা করে যেতে চাই — যদিও এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বহু মানুষের আত্মত্যাগ, অনেক আদর্শ চরিত্রের আবির্ভাব, ক্ষুদিরামের উদাহরণ ইত্যাদি আমাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও এইসব জিনিসের প্রভাব আজ জনজীবনের উপর, সমাজের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করে নেই। সাময়িকভাবে খানিকটা দূর পর্যন্ত এইসব মনীষীদের কার্যকলাপ সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারেনি। কেন? এর কারণ, আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের, মানবতাবাদী আন্দোলনের মূলধারার মধ্যেই ছিল প্রধান দুর্বলতা। ইউরোপের মানবতাবাদী আন্দোলন সেকুলার মানবতাবাদের ভিত্তিতে ধর্মের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করে গড়ে উঠেছিল বলে সেখানে যেমন জাতীয় চরিত্রের একটা সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, আমাদের দেশের মানবতাবাদী আন্দোলন তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, মানবতাবাদী আন্দোলন ছিল ধর্মভিত্তিক, তা ধর্মের সঙ্গে আপস করেছে, ভাববাদের সঙ্গে আপস করেছে, জাতপাতের সঙ্গে আপস করেছে। ফলে, এদেশের বুর্জোয়াদের জাতীয় চরিত্র একটা সুদৃঢ় ভিত্তি নিয়ে গড়েই উঠতে পারেনি। এই কারণেই যুগ যুগ ধরে পুরনো ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনে, জাতপাতের ধারণায় এবং কু-আচারে, কুসংস্কারে ধসে যাওয়া, কুঁকড়ে যাওয়া, বেঁকে যাওয়া জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙে ফেলে একটা নতুন তেজে তাকে খাড়া করতে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, মানবতাবাদী আন্দোলন সক্ষম হয়নি। হয়নি বলে অর্ধপথে কিছু দূর কিছু মানুষকে তারা এগিয়ে দিয়েছিল। তারপরে বুর্জোয়ারা ক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বলতার জন্য, আমাদের রেনেসাঁসের ভাবধারা গভীরে আঁচড় কাটতে পারল না বলে পুরনো অর্থহীন, মেরুদণ্ডহীন যে বৈশিষ্ট্যগুলো জাতির জীবনে থেকেই গিয়েছিল, সেই দোষগুলিই সমাজের মধ্যে আজ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এবং বুর্জোয়ারাও তাকে সুকৌশলে কাজে লাগাচ্ছে। এই অবস্থায় আমরা যারা সমাজবিপ্লব সংগঠিত করতে চাই, তারা যদি এগুলোর বিরুদ্ধে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে না তুলি, বর্তমান সমাজবিপ্লবের পরিপূরক সংস্কৃতির সুরটা প্রতিদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে একই সঙ্গে না মেলাতে পারি এবং তার দ্বারা সমাজের এই অবক্ষয়িত ধারাকে যদি খানিকটা প্রতিহত না করতে পারি, তা হলে কি আমরা বিপ্লবের উপযুক্ত নৈতিক বল সমাজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারি? আর, তা যদি আমরা না পারি, তা হলে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে দু-চার দিনের মারমুখী লড়াই হয়তো আমরা পরিচালনা করতে পারি, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে একটা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম— যেমনভাবে ভিয়েতনামের মানুষরা লড়ছে, যে ধরনের সংগ্রাম পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে হলে এখানে করা দরকার হবে— অর্থাৎ জনগণের রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান বলতে আমরা যা বুঝি, তা আমরা গড়ে তুলতে পারি নাকি? শুধু স্লোগান দিয়ে তা গড়া যাবে না, হাজার বার মার্কসবাদের মন্ত্র জপলেও গড়া যাবে না।

সমস্ত আদর্শেরই মর্মবস্তু নিহিত থাকে
তার সংস্কৃতিগত মানের মধ্যে

মনে রাখবেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হোক, আর যে কোনও আদর্শবাদই হোক, শুধু কতকগুলো কথার মধ্যে কোনও আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত থাকে না। যে কোনও আদর্শের আসল পরিচয় বা মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিগত, নীতিগত এবং রুচিগত মানের মধ্যে। না হলে বই পড়ে বড় বড় রাজনীতির কথাগুলো যে কোনও 'মিডিওকার' পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারে এবং সেগুলো বলতে পারে। তাই মার্কস থেকে শুরু করে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ পর্যন্ত বা যাঁরাই হাতেকলমে বিপ্লব করেছেন, সকলেই একটা কথার উপর জোর দিয়েছেন, তা হচ্ছে, কোনও আদর্শ বড় হলেই তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় না, যদি সেই আদর্শকে রূপায়িত করবে যে মানুষগুলো তারা সেই আদর্শকে রূপায়িত করবার মতো বড় মানুষ এবং উন্নত চরিত্রের না হয়। তাই মার্কসবাদী আন্দোলনে ডি-ক্লাসড রেভোলিউশনারি বা প্রফেশনাল রেভোলিউশনারি গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাঁরা এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই মাও সে-তুঙকে বলতে শুনি— কেউ মার্কসবাদ বুঝেছেন কি না এবং তত্ত্ব ও কর্মের সংযোজন ঠিকমতো করতে পেরেছেন কি না, তার প্রমাণ তিনি কত বই পড়েছেন বা কত বই লিখেছেন তাতে নেই বা তার প্রমাণ কত স্লোগান তিনি দিয়েছেন এবং কত জেল তিনি খেটেছেন তাতেও নেই। তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে, তিনি উন্নত সংস্কৃতি এবং

কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষা

উন্নত নৈতিক বলের অধিকারী হয়েছেন কি না। ইয়েনানের স্কুলে পার্টির নেতা ও কর্মীদের কাছে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই কথা বলেছেন। বলেছেন, কারওর মধ্যে মার্কসবাদের উপলব্ধি ঠিকমতো ঘটেছে কি না, তা বোঝবার এইটিই একমাত্র কষ্টিপাথর। অথচ আমাদের দেশের মার্কসবাদী আন্দোলনে এই কষ্টিপাথরটির উপরে আমরা একেবারে জোর দিই না। বামপন্থী আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন এ দেশে দীর্ঘদিন শুরু হওয়া সত্ত্বেও এমনভাবে তা যে বিপথগামী হল, তা যে বারবার নানা ধরনের সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ এবং শোধনবাদের খপ্পরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়ছে, এক ধরনের শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আর এক ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ছে, বা এক ধরনের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আর এক ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ছে, তার একটা প্রধান কারণ, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই মর্মবস্তুর দিকটিকে এখানে অবহেলা করা হয়েছে।

এ দেশের অনেক তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এমন কথাও বলতে শুনেছি যে, নীতিনৈতিকতা, আদর্শবাদ এগুলো সব নাকি বুর্জোয়াদের কুসংস্কার। তাদের বক্তব্য, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নাকি নীতিনৈতিকতা, আদর্শবাদ বলে কোনও জিনিস নেই। আমি কিন্তু এমনভাবে মার্কসবাদ বুঝিনি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এমন বুঝলে আমি বহুদিন আগেই তা পরিত্যাগ করতাম। আমি বুঝেছি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে এ যুগের সবচেয়ে উন্নত মানের আদর্শবাদ। এর মধ্যেই রয়েছে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিনৈতিকতার ধারণা, এর চেয়ে বড় আদর্শবাদ নেই। বুর্জোয়া মানবতাবাদের সঙ্গে, ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে এর পার্থক্য হচ্ছে, বুর্জোয়া মানবতাবাদ বা ধর্মীয় মূল্যবোধে নীতিনৈতিকতার একটা শাশ্বত কাঠামো আছে— আর, মার্কসবাদ-লেনিনবাদে যে নীতিনৈতিকতার ধারণা, জীবনসংগ্রামের দ্বারা তার রূপ ক্রমাগত পাল্টায়। বাস্তব অবস্থা এবং মানুষের যথার্থ প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর নীতিনৈতিকতার ধারণা পাল্টাতে থাকে। মানুষের এই যে যথার্থ প্রয়োজন, এটা কারও ব্যক্তিগত প্রয়োজনবোধ নয়। পরিবর্তনের যেটা যথার্থ প্রয়োজন, তার দিকে লক্ষ রেখে এর নীতিনৈতিকতার ধারণাগুলোরও ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে। যেমন করে সমাজ পাল্টাচ্ছে, উৎপাদন ব্যবস্থা পাল্টাচ্ছে, মানুষের প্রয়োজনের উপলব্ধি বা প্রয়োজনবোধ পাল্টাচ্ছে, সংগ্রামের প্রক্রিয়া পাল্টাচ্ছে, শ্রেণিসংগ্রামের রূপ পাল্টাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক স্তর থেকে আর এক স্তর পর্যন্ত, তেমনি এর নীতিনৈতিকতার ধারণাও পাল্টাচ্ছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদে নীতিনৈতিকতার ধারণা রয়েছে বৈকি এবং সেটা খুব উন্নত ধারণা, বুর্জোয়া মানবতাবাদের চেয়েও উন্নত ধারণা। তাই দেখবেন, মার্কস কমিউনিজমের কথা কেন বলেছেন, তা নিয়ে একদল তাঁকে একসময় প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ, তাঁরা মনে করতেন, মানবতাবাদের চাইতে উন্নত আদর্শবাদ কিছু নেই। মার্কস তার উত্তরে তাঁদের বলেছিলেন, তাঁরা যে মানবতাবাদের কথা বলছেন, তা আসলে বুর্জোয়া মানবতাবাদ। আর, তিনি যে কমিউনিজমের কথা বলছেন, তাও মানবতাবাদই। কিন্তু কমিউনিজম হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে মুক্ত মানবতাবাদ। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি কথাটা শুধু বস্তুগত অর্থে তিনি বোঝাতে চাননি। অর্থাৎ বাড়ি-ঘর, টাকা-পয়সা, আরাম-আয়েস, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, এই যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধার, এটাকেই তিনি শুধু বোঝাননি। যারা তাঁর কথা ঠিকভাবে বুঝেছে, তারা জানে যে, তিনি এর দ্বারা এতদূর পর্যন্ত বলতে চেয়েছেন যে, এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যখন চলে যাবে বা কেউ ছেড়ে দেবে, তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে গড়ে ওঠা যে মানসিক ধাঁচা থেকে যাবে— অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বা প্রফেশনাল ইগোসেনট্রিসিজম-এর মধ্যে যার রূপ আমরা দেখতে পাই, তার থেকেও নিজেকে মুক্ত করতে পারে যে মানবতাবাদ, সেই মানবতাবাদ হচ্ছে কমিউনিজম। তা হলে ভারতবর্ষে এই সমস্ত তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টির যাঁরা নেতা, তাঁরা নিজেরা আগে কমিউনিস্ট হলে এবং এই কমিউনিস্ট নীতিনৈতিকতার অধিকারী হলে তবে তো অপরকে নেতৃত্ব দেবেন। তা এই সমস্ত তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতাদের অনেকেই বস্তুগত অর্থেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে আজও ছাড়তে পারেননি, সেখানে তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে উদ্ভূত মানসিক ধাঁচা থেকে নিজেদের মুক্ত করবেন কী করে? বিষয়টা এত সোজা নয়।

('বর্তমান পরিস্থিতি এবং গণআন্দোলনে প্রধান বিপদ'
শিবদাস ঘোষ নির্বাচিত রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড)

রাষ্ট্রপতি

তিনের পাতার পর

আদিবাসী ব্যক্তিকে পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে বসিয়ে দিলেই তা কোনও মতে দূর হতে পারে না। এর জন্য জরুরি শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাটির অবসান এবং সমাজের গণতন্ত্রীকরণ, জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ঊর্ধ্বে মানসিকতার উত্তোলন।

ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সমাজের গণতন্ত্রীকরণের এই কাজটি মুখ থুবড়ে পড়েছে আপসকামী নেতৃত্বের প্রাধান্যের কারণে। আজ স্বাধীন ভারতে এই কাজটি ব্যাহত করছে সংসদসীয় বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া এবং সংসদীয় বাম দলগুলিও। পুঁজিপতিশ্রেণি চায় জনগণের ঐক্য ধ্বংস করার জন্য এই ধরনের জাত-পাতগত সমস্যা জিইয়ে রাখতে, খুঁচিয়ে তুলতে। ফলে এদেরই স্বার্থরক্ষক বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই সমস্যাগুলি সমাধানের কোনও উদ্যোগই নেয় না, নিতে পারে না। আজ জাতিগত বিভেদের, আধিপত্যের এই সমস্যাগুলি দূর করার সংগ্রামটি ঐতিহাসিক ভাবে শোষণ-বঞ্চনাবিরোধী, পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে। দলিত, আদিবাসী সহ সমস্ত স্তরের খেটেখাওয়া মানুষকে এই সত্য বুঝতেই হবে—আজ ন্যূনতম অধিকার, সংস্কৃতি, ভাষা, সাংস্কৃতিক সামাজিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হলেও প্রয়োজন শোষিত সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। এর মধ্য দিয়েই একদিকে গণতান্ত্রিক দাবিগুলি শক্তিশালী হবে, অন্যদিকে সকল মানুষের অবাধ বিকাশের উপযোগী নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্য লড়াইয়ের শক্তি এর থেকেই অর্জিত হবে।

মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, জানেন না নাকি অর্থমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৭ সেপ্টেম্বর বলেছেন, দেশে মূল্যবৃদ্ধি কোনও গুরুতর সমস্যা নয়।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রে মন্ত্রীদের মিথ্যা কথা বলা রপ্ত করতেই হয়, কিন্তু এতটা নির্জলা মিথ্যা বলতে সকলে পারেন কি না সন্দেহ হয়। এ ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য সতীর্থ তা স্বীকার না করে উপায় নেই। অর্থমন্ত্রীর স্মৃতিশক্তি দুর্বল ভাবার কোনও কারণ নেই। তা হলে মূল্যবৃদ্ধির আগুনে মানুষ যখন পুড়ছে, তিনি এ কথা বললেন কেন?

গত জুলাইয়ে প্যাকেটের খাদ্যপণ্যের উপর ৫ শতাংশ জিএসটি বাড়িয়েছে তাঁর সরকার, যার অর্থমন্ত্রী স্বয়ং তিনি। সরকারি এই মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে এক মাসের মধ্যে দেখা গেল, বাস্তবে দাম বাড়ানো হয়েছে ২০-৫০ শতাংশ। ১ আগস্ট এক কেজি মিনিকিট চালের দাম ছিল ৪৫ টাকা। ২২ আগস্ট তা বেড়ে হয়েছে ৫৫ টাকা। বৃদ্ধির হার ২২ শতাংশ। খুচরো আটার দাম ছিল ২৫ টাকা কেজি। তার দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ টাকা। বৃদ্ধির হার ৪০ শতাংশ। মুড়ি ৫০ টাকা কেজি থেকে দাঁড়িয়েছে ৬০ টাকা। বৃদ্ধির হার ২০ শতাংশ। বিস্কুটের দাম বেড়েছে সব চেয়ে বেশি। ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ। এই অতিরিক্ত দাম বাড়াল কারা এবং কী ভাবে নির্মলা দেবী তার জবাব দেবেন কি?

অর্থনীতির অতি বড় পণ্ডিত না হয়েও যে কেউ বোঝেন, দাম বাড়িয়েছে খাদ্য পণ্যের বড় বড় ব্যবসায়ীরা, একচেটিয়া মালিকরা। কী করে বাড়াতে পারল? কারণ বাজারে সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। সরকার খাদ্য ও কৃষিপণ্য সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের পুরো বাজারকে বৃহৎ একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। তারা যেমন ইচ্ছা দাম বাড়িয়ে মুনাফা লুটছে। আর তার চাপে বিপর্যস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবন। এটাই আমাদের দেশে বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিবার্য পরিণাম। পুঁজিপতিদের স্বার্থে পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত সেবক সরকার এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না। তাই অর্থমন্ত্রী মূল্যবৃদ্ধি দেখতেই পান না। আর যিনি মূল্যবৃদ্ধি দেখতে পান না, তিনি যে মূল্যবৃদ্ধির আসল কারবারিদের দেখতেও পাবেন না— তা তো বলাই বাহুল্য! শুধু বিজেপি কেন, কংগ্রেস, তৃণমূল ইত্যাদি কোনও সরকারই এ প্রশ্নে পুঁজিপতিদের বিব্রত করে না। কারণ, এদের দেওয়া টাকাতেই এইসব দল চলে। পার্টির খরচ, ভোটের খরচ জোগায় এরাই। পুঁজিপতি, বড় ব্যবসায়ী, কালোবাজারিদের খুশি করতেই এরা দেশে কালোবাজারি, মজুতদারির বিরুদ্ধে যে সব আইন ছিল, সেগুলিও নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে।

পুঁজিপতিদের সেবক ডান ও বাম দলগুলির ভূমিকা দেখে জনগণের একাংশের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে বসেছে যে, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারবে না। দেশের অর্থনীতিবিদরা মূল্যবৃদ্ধির নানা ব্যাখ্যা দিলেও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কোনও কার্যকরী পথ দেখাতে পারছেন না। সরকারবিরোধী অন্যান্য দলগুলিরও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বক্তব্য একান্তই দায়সারা। কারণ মূল্যবৃদ্ধি সমস্যার উৎস যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি, তার সেবাদাস হয়ে তারা কী করে ওই দিকে আঙুল তুলবে? ফলে এইসব দলের নেতারা হামেশাই বলে থাকেন, মূল্যবৃদ্ধি কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এদের মুখে অবিরাম শুনতে শুনতে জনগণের একাংশ বিশ্বাস করে বসে, এ নিয়ে কিছু করার নেই। কিন্তু সত্যিই কি নেই?

১৯৫০-এর দশকে, '৬০-এর দশকে এ রাজ্যে তীব্র বামপন্থী আন্দোলনের সময়ে মূল্যবৃদ্ধি রোধে কার্যকরী ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা মার্কসবাদী চিন্তাবিদ শিবদাস ঘোষ। তাঁর নেতৃত্বে এস ইউ সি আই (সি) দল স্পষ্ট দেখায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা, বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে। কারণ বেঁচে থাকাটা প্রধান প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকার চাষিদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে খাদ্যপণ্য কিনে নেবে। তারপর সেগুলি সরকারি ব্যবস্থাপনায় যথাসম্ভব কম দামে বিক্রি করবে যাতে জনগণ তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে পারে। 'নো-প্রফিট নো-লস' নীতির ভিত্তিতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় খাদ্যদ্রব্যের খুচরো ও পাইকারি উভয় ব্যবসাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির আগুন থেকে মানুষকে খানিকটা বাঁচানো যায়।

এই বক্তব্য মানুষের মধ্যে প্রবল সমর্থনও পায়। কিন্তু পুঁজিপতিদের স্বার্থে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার তা কার্যকর করেনি। ১৯৬৭-১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসবিরোধী যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন শরিক দলগুলিও এই প্রস্তাব মেনে নেয়নি। ১৯৭৭ থেকে দীর্ঘ ৩৪ বছরে সিপিএম সরকারও এই নীতি কার্যকর করেনি। ফলে জনগণ মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পুড়ছেই। খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি জনগণের উপর একটা মারাত্মক আক্রমণ হিসাবেই থেকে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে বেশির ভাগ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে। তার উপর কোভিড অতিমারি আর্থিক দুরবস্থাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। ভারতে ক্ষুধা পরিস্থিতি ক্রমাগত বাড়ছে। ২০২১-এর বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১১৬টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১০১, যা ভয়াবহ ক্ষুধা পরিস্থিতিরই উৎকট চিত্র।

মূল্যবৃদ্ধি পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিবার্য ফল। এই সংকটের স্থায়ী সমাধান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বজায় রেখে কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের মধ্যদিয়েই মূল্যবৃদ্ধির সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। কারণ, সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ মুনাফা নয়। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সমাজতন্ত্র না হচ্ছে, মূল্যবৃদ্ধি কি মেনে নিতেই হবে? একেবারেই নয়। একে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। নিয়ন্ত্রণের এই পথটাই জোরের সাথে তুলে ধরেছে এস ইউ সি আই (সি)।

এই দাবি আন্দোলনের জোরেই মানাতে হবে। এই শিক্ষাই দিয়েছে দিল্লির কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলনের আরেকটি শিক্ষাও স্মরণীয়। এই কৃষক আন্দোলনের বিভিন্ন দাবি সরকার চাপে পড়ে মেনে নিলেও এখন দেখা যাচ্ছে, ঘুরপথে কৃষিক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাকে ঢোকার রাস্তা করে দিচ্ছে। এদেরই স্বার্থে মোদি সরকার গমের সরকারি সংগ্রহ ৫০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সচিব সুধাংশু পাণ্ডে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা কমানো হয়েছে যাতে বেসরকারি কোম্পানিগুলি প্রচুর গম কিনতে পারে (সূত্র ঃ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৮-৯-২২)। এর ফল কী দাঁড়াবে? এরাই পরে নানা কিসিমের ব্র্যান্ডের ছাপ মেরে আটা, ময়দা, সুজি ইত্যাদি বিক্রি করবে আগুন দামে। খুচরো ব্যাবসাটার পুরো ক্ষেত্রটা এই বৃহৎ একচেটিয়াদের দখলে চলে যাবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, এদের কবল থেকে উৎপাদনকে মুক্ত করা কত জরুরি। ভোটে এক দলের বদলে আর এক দলকে সরকারি গদিতে বসালেই মূল্যবৃদ্ধির সমস্যার সমাধান হবে না। মূল্যবৃদ্ধি পুরোপুরি রদ হওয়া সম্ভব বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে বদলে সমাজতন্ত্র কায়েম করার দ্বারা। কিন্তু যতদিন তা না হয়— লাগাতার সংঘবদ্ধ গণআন্দোলনই হল মূল্যবৃদ্ধিতে কিছুটা লাগাম পরানোতে সরকারকে বাধ্য করার একমাত্র রাস্তা।

ডেঙ্গু প্রতিরোধের দাবিতে
ব্যারিকেড ভাঙল মিছিল

সারা রাজ্যের মতো কলকাতাতেও ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। ইতিমধ্যে গত মরশুমের তুলনায় এ মরশুমে ডেঙ্গুর প্রকোপ প্রায় সাতগুণ বেড়েছে। এর প্রতিবাদে প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগ তুলে ১৯ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতা কর্পোরেশনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখানো হয়।

জেলা সম্পাদক সুব্রত গৌড়ী ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নভেন্দু পালের নেতৃত্বে দুই শতাধিক মানুষের এক মিছিল ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে কর্পোরেশনের সদর দপ্তরের সামনে পৌঁছলে পুলিশ তা আটকাতে চেষ্টা করে। ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যায় মিছিল। কর্পোরেশনের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখানো হয়।

বিক্ষোভসভায় দলের কলকাতা জেলা সম্পাদক সুব্রত গৌড়ী বলেন, সরকারি হিসাবেই শুধুমাত্র গত ৩ সপ্তাহে রাজ্যে আক্রান্ত ৫ হাজারেরও বেশি এবং কলকাতায় গত জানুয়ারি থেকে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫০ জনের বেশি। ইতিমধ্যে কলকাতার ২৪টি ওয়ার্ডকে ডেঙ্গু প্রবণ ও ৩৫টি ওয়ার্ডকে ম্যালেরিয়াপ্রবণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে মেয়রের নিজের ওয়ার্ডেই ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা তালিকার উপরের দিকে। মেয়রের ওয়ার্ডের নাগরিকরা যেখানে সুরক্ষিত নন সেখানে সমগ্র কলকাতার অবস্থা কী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দূরের কথা, কলকাতার ডেপুটি মেয়র বলছেন, ডেঙ্গু নিয়ে নাকি আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। মেয়র মানুষের সচেতনতার উপর দায় চাপিয়ে নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলেছেন। কলকাতা পুরসভা বিবৃতি দিয়ে দায় না সেরে সঠিক তৎপরতা দেখালে শহর কলকাতায় ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ার এই রকম প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারত না।

দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ডাক্তার অংশুমান মিত্রের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল কর্পোরেশনের মুখ্য স্বাস্থ্য অফিসারের সঙ্গে দেখা করেন এবং সমস্ত বরোয় রক্তপরীক্ষা ও চিকিৎসার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তৈরি, পাড়ায় পাড়ায় ফিভার ক্লিনিক খোলা, মশা মারার জন্য সমস্ত পাড়ায় ভেক্টর কন্ট্রোলের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, পুরসভার উদ্যোগে রক্ত ও প্লেটলেটের ঘাটতি মেটানোর জন্য রক্তদান শিবির করা ইত্যাদি দাবি জানান। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নির্লজ্জের মতো বলেন, ডেঙ্গু হবেই, তাতে মৃত্যুও হবে। আমাদের কিছু করার নেই। প্রতিনিধিদল এই দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করলে তিনি বলেন, রক্ত পরীক্ষা ও ভেক্টর কন্ট্রোলের বিষয়টা তাঁরা দেখবেন।

রাস্তা সারানোর দাবি কালনায়

পূর্ব বর্ধমানের লিচুতলা থেকে কালনা কোর্ট, নিভূজি মোড় থেকে বাঘনাপাড়া এবং নিভূজি বাজার থেকে তালবোনা পর্যন্ত পিচ রাস্তাগুলি কয়েক বছর থেকে চলাচলের অযোগ্য। এ পর্যন্ত এক জন স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে এবং কয়েক জন পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন। এলাকার সাধারণ মানুষ এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু প্রশাসন বিন্দুমাত্র নড়েচড়ে বসেনি।

এই অবস্থায় এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর ওই রাস্তাগুলি দ্রুত মেরামত, পথচলতি মানুষের জীবন সুরক্ষার দাবি নিয়ে কালনা মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভের পর ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মহকুমা শাসক রাস্তাগুলি দ্রুত মেরামতের আশ্বাস দেন।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের কনভেনশন রামপুরহাটে

২০১৫ সালের আগে ও পরে যে সমস্ত নন-রেজিস্টার্ড চিকিৎসকদের নাম নথিভুক্ত হয়নি তাদের নাম নথিভুক্তি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোর্স কারিকুলাম তৈরি করে রেজিস্টার্ড ডাক্তার দিয়ে ট্রেনিং-সার্টিফিকেট দেওয়া ও বিএমওএইচ-এর অধীন মেডিকেল অফিসারের সহকারী হিসাবে নিয়োগ করা, রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে সমস্ত বিভাগে সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা চালু, ডাক্তার-নার্স-প্যারামেডিকেল স্টাফ নিয়োগ ও তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যভবনের নির্দেশ অনুযায়ী ৬ মাসের প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার কোর্স সব ব্লক হাসপাতালে অবিলম্বে চালু এবং গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধের দাবিতে ১৮ সেপ্টেম্বর বীরভূমের রামপুরহাট শহরে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

পিএমপিএআই-এর রাজ্য সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম, রাজ্য সহসভাপতি যুগল পাখিরা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। কনভেনশন থেকে মোজাব্বার হোসেনকে সভাপতি, আসমাতুল্লা (সালাউদ্দিন)-কে সম্পাদক ও রৌনক আহাম্মেদকে কোষাধ্যক্ষ করে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ছাত্র মিছিলে ভাসল রাজপথ

কলেজ স্ট্রিট। ১৪ সেপ্টেম্বর

একের পাতার পর

ফিরিয়ে দাও, এসএসসি দুর্নীতির বিচার চাই, অবিলম্বে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীদের শাস্তি চাই, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল করতে হবে, পিপিপি মডেল প্রত্যাহার করতে হবে।

বিগত দু'বছরে করোনা অতিমারির সুযোগে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর মারাত্মক আক্রমণ হেনেছে কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকার। স্কুল-কলেজ ধারাবাহিকভাবে বন্ধ রেখে অনলাইন শিক্ষাকে বাধ্যতায় পরিণত করা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এবং ক্লাসরুমের পরিবেশকে গুরুত্বহীন করে মূলত তথ্যনির্ভর অ্যাপনির্ভর পড়াশুনাকে প্রাধান্য দেওয়া, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো উন্নত করার বদলে একের পর এক সরকারি স্কুল তুলে দিয়ে, সরকারি স্কুল কলেজে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করে স্কুল কমপ্লেক্সের নামে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশফেল তুলে দিয়ে কয়েকটি প্রজন্মের বুনিয়াদি শিক্ষার যে সর্বনাশ ইতিমধ্যেই সূচিত হয়েছে, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাকেও তুলে দিয়ে বা ঐচ্ছিক করে তাকে আরও পাকাপোক্ত করা, গবেষণা সহ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রগুলোতে গবেষক-অধ্যাপক-শিক্ষাবিদদের স্বাধীনতা হরণ, ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের নামে যাবতীয় অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান বিকৃত ইতিহাসকে প্রশ্রয় দেওয়া— সমস্ত পদক্ষেপই নেওয়া হচ্ছে দেশ জুড়ে শিক্ষার সার্বিক বেসরকারিকরণ গৈরিকীকরণের লক্ষ্যে।

অন্য দিকে এ রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগে ভুরি ভুরি দুর্নীতির নগ্ন রূপ দেখে মানুষ যখন শিউরে উঠছেন, তখনও রাজ্যের শাসক দল উপযুক্ত তৎপরতায় অভিযুক্তদের শাস্তি দেওয়া, অন্যায় ভাবে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের দ্রুত নিয়োগ করার বদলে ক্লাবগুলোর পুজোয় কোটি কোটি টাকা অনুদান দিতে, ইউনেস্কোর ধন্যবাদ মিছিলে লোক জড়ো করতে ব্যস্ত। ছাত্রসমাজের, সাধারণ মানুষের এই চূড়ান্ত বিপন্নতার দিনে একটি দায়িত্বশীল ছাত্র সংগঠন হিসাবে এআইডিএসও প্রথম থেকেই প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। স্কুল কলেজ খোলার দাবিতে আন্দোলন করে ২০২১-এ বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এগারো জন ডিএসও কর্মী, মিথ্যে মামলায় জেল হেফাজতে আটকে রাখা হয়েছিল তাঁদের। খুব সম্প্রতি কোচবিহারে ফি বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের ওপর তৃণমূল-পুলিশের বর্বর আক্রমণে একাধিক ছাত্রকর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন, তেরো জন প্রতিবাদী ছাত্রকে মিথ্যে অভিযোগে জেলে আটকে রাখা হয়েছে দিনের পর দিন। এসব কোনও কিছুই যে সংগঠনের মনোবলকে এতটুকু দমাতে পারেনি, তা আবারও বুঝিয়ে দিল ১৪ তারিখের বিশাল সমাবেশ। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়-গবেষণাক্ষেত্র-মেডিকেল-ইঞ্জিনিয়ারিং সহ শিক্ষার সমস্ত ক্ষেত্র থেকে আসা হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর দৃপ্ত মিছিল সোচ্চারে প্রমাণ করল, সঠিক আদর্শে পরিচালিত আন্দোলনের শক্তি শাসকের চোখরাঙানির চেয়ে অনেক বেশি।

সমাবেশের মঞ্চ থেকে রাজ্য সম্পাদক কমরেড মনিশঙ্কর পট্টনায়ক বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি এ রাজ্যে তাকে ঘুরপথে প্রয়োগের পরিকল্পনা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন। গণতান্ত্রিক ছাত্র আন্দোলন ছাড়া এই আক্রমণ রুখে দেওয়া সম্ভব নয়। কেবল সরকারি ক্ষমতার অদল-বদল করে এই সঙ্কটের সমাধান সম্ভব নয়, চাই সংগ্রামী বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সমর মাহাতো, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কমরেড সামসুল আলম। জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ডিএসও-র যে স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে, ২৮ সেপ্টেম্বর তার সমাপ্তি সমাবেশকে সার্বিক ভাবে সফল করে তোলার আহ্বান রাখেন সংগঠনের নেতৃত্ব।

কলেজ স্কোয়ার থেকে স্লোগান মুখরিত সুশৃঙ্খল ছাত্র মিছিল এগোয় রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের দিকে, রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা শহর কলকাতার পথচলতি মানুষ সেদিন প্রবল আগ্রহ উৎসাহ নিয়ে দেখেছেন এই বিশাল মিছিল, আকাশের দিকে উদ্যত মুষ্টিবদ্ধ হাতের সারি আর উড্ডীন রক্তপতাকা। দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন শিক্ষার অধিকার রক্ষায় পথে নামা এই ছাত্রদের, কোথাও ভেসে এসেছে তাঁদের ভরসার স্বর— 'পারবে, এরাই পারবে।'

শাসক শ্রেণির বশংবদ মিডিয়ায় স্বভাবতই সেদিনের মিছিল জায়গা পায়নি, কিন্তু কলকাতার রাজপথে অগণিত সংগ্রামী ছাত্রের এই সম্মিলিত প্রতিবাদ নতুন করে আশা-ভরসা জাগিয়ে গেছে মুক্তিকামী মানুষের মনে।

অবিলম্বে মনুষ্যসৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির প্রতিকার চাইল

পাকিস্তানের প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স

প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্সের আহ্বায়ক এবং পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ কাজি সে দেশের সাম্প্রতিক বন্যা-পরিস্থিতি প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সর্বোচ্চ মুনাফা লুঠের লক্ষ্যে নির্বিচারে প্রকৃতির ক্ষতি করেছে। পরিণতিতে পরিবেশ দূষিত হয়ে জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে চলেছে, যার ফলে প্রকৃতি ও মানুষ— উভয়ই ধ্বংসের পথে চলেছে। বিশ্বের ধনী দেশগুলির সৃষ্টি করা পরিবেশ-দূষণের কারণে আজ পাকিস্তানের মানুষ বৃষ্টি ও বন্যায় ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। দেশের চারটি রাজ্য এবং গিলগিট-বালটিস্তান বন্যায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

বৃষ্টির জল বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বছরের পর বছর ধরে যে সব প্রাকৃতিক পথগুলি ছিল, সিন্ধের সামন্তী প্রভুরা, বিশেষত যারা সরকারের অংশ, সেগুলির দখল নিয়ে মাছ চাষের পুকুর ও বিশালাকার খামার তৈরি করেছে। জারদারি-শাসনের অংশ যে সামন্তী প্রভুরা, যাঁরা এক-একটা জেলায় রাজার মতো ক্ষমতা ভোগ করেন, তাঁরা নিজেদের মালিকানাধীন এলাকা থেকে বন্যার জল বের করতে সরকারি টাকা অপব্যবহার করছেন।

এই বন্যায় ইতিমধ্যে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পশু হয় মারা গেছে নয়তো ভেসে গেছে। দিনের পর দিন জল জমে থাকায় ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, পেটের অসুখ ও চর্মরোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটছে। মশার জ্বালায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। পানীয় জল প্রায় অমিল। বর্তমানে শিশু ও মহিলা সহ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর সাধারণ মানুষ খোলা আকাশের নিচে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। দ্রুত এই দুরবস্থা দূর করার বদলে পাকিস্তানের লোভী ও নিষ্ঠুর শাসকদের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, তারা এই বন্যা-পরিস্থিতি জিইয়ে রাখতেই চায় যাতে বিশ্বের নানা দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণ ও ঋণ পাওয়া যায়।

প্রোগ্রেসিভ অ্যালায়েন্সের পক্ষ থেকে, বন্যা পরিস্থিতির উন্নতিতে অবিলম্বে সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়া বন্যাত্রাণ বণ্টনের জন্য তৈরি কমিটিতে বন্যাদুর্গতদের সম্পর্কে ভালো ভাবে জানেন যাঁরা, তাঁদের যুক্ত করার দাবি করা হয়েছে।

নিয়োগের দাবিতে দুরগে এআইডিওয়াইও-র আন্দোলন

শূন্যপদে নিয়োগের দাবিতে ছত্তিশগড়ের দুরগে ১৫ সেপ্টেম্বর এআইডিওয়াইও-র নেতৃত্বে যুবকদের একটি মিছিল সংগঠিত হয়। সংগঠনের নেতা বিশ্বজিৎ হারোড়ে জানান, হাজার হাজার বেকার যুবক কাজের খোঁজে হন্যে হলেও রাজ্যের কংগ্রেস সরকার নিয়োগ বন্ধ করে রেখেছে। সেখানকার আড়াই লাখের বেশি সরকারি শূন্যপদে অবিলম্বে বেকার যুবকদের নিয়োগ, কাজ না দেওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত পরিমাণে বেকারভাতা, কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি, ন্যূনতম বেতন ২১ হাজার টাকা করা, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের বদলে স্থায়ী নিয়োগের দাবি তুলছেন সংগঠকরা।

ছাত্রী অঙ্কিতা সিংয়ের হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে এবং দেশ জুড়ে মহিলাদের ওপর ঘটে চলা নির্যাতনের প্রতিবাদে ঝাড়খণ্ডে জামশেদপুরের সাকচিতে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস-এর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর

ঘোষণা ঃ শারদীয় উৎসব উপলক্ষে ছাপাখানা বন্ধ থাকায় গণদাবীর পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে আগামী ২১ অক্টোবর ২০২২

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com